নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

ধারাবাহিক বিশেষ কলাম-২

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি

প্রকাশ : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ০০:০০ | **আপডেট :** ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ০০:৫১

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

১৯৬৯ সালে ক্ষমতার পালাবদলে ইয়াহিয়া খান শাসন ক্ষমতায় আসেন। তার খায়েস ছিল যে গণতন্ত্র দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি হবেন। তাকে গোয়েন্দা বাহিনী মোটামুটি এই আশ্বাস দিল যে, শেখ মুজিব অনেক বড় মাপের নেতা। তার কথা লোকে শোনে। কিন্তু যখন নির্বাচন হবে তখন অখ- পাকিস্তানের একটা সমর্থক গোষ্ঠী আছে এবং সব মিলিয়ে পূর্ববাংলার ভোট ভাগাভাগি হবে। এতে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুজিববিরোধী ভোট নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের। ছয় দফা টিকবে না। এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে বাঙালিদের জন্য একটা বড় ধরনের লাভ হয়ে যায়, 'এক লোক এক ভোট।' এটা এর আগে কখনো স্বীকৃত হয়নি। এটা গিলানো হয়েছিল 'দেব আর নেব হিসেবে।' এটা একটা ট্রেড অফ। ইয়াহিয়া খান মানলেন যে, তিনি এক ব্যক্তি এক ভোটে নির্বাচন করবেন। আর এদিক থেকে বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতারা মানলেন, লিগেল ফ্রেইমওয়ার্ক অর্ডার। এলএফও-তে কিছু মারাত্মক বিষয় আছে। এটাতে রয়েছে, চার মাসের মধ্যে সংবিধান রচনা করতে না পারলে ওই সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জয়ের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। তখন একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে। ২৫ নভেম্বর নির্বাচন ছিল। কিন্তু ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয়। কয়েক লাখ লোক নিহত হন এবং সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চিন সফরে যান ইয়াহিয়া। এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধুর শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর পিছিয়ে দেওয়া তারিখে নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, ৩০০ আসনের সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পায় আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে ছয় দফা দাবি আরও প্রচ-ভাবে সমর্থিত হলো।

বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদ অধিবেশন ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাকার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সেটা ৩ মার্চ ডাকলেন। মনে হলো যেন ভুট্টোর পরামর্শে তিনি এটা করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী অধিবেশন বসার কথা শেরেবাংলা নগরে দ্বিতীয় রাজধানীতে। যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়েছিল তাতে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংবিধান রচনা করে ফেলবেন

ছয় দফার ভিত্তিতে। তখনই সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যু হয়ে যাবে। এটা ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা বুঝলেন। পরে ভুট্টো এলেন ঢাকায়, ইয়াহিয়াও এলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। অচলাবস্থা। তার মধ্যে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাংবাদিকদের বললেন, 'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।' একটা ধোঁয়াশার মতো সৃষ্টি করলেন। তার পর ১ মার্চ যখন সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন, ইয়াহিয়া খান বুঝিয়ে দিলেন বাঙালিরা ক্ষমতায় বসতে পারবে না, তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে না। ১ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত হলো প্রচ- গণআন্দোলন, অভূতপূর্ব ঐক্য। প্রকৃতপক্ষে তখন দেশ শাসিত হলো শেখ মুজিবের নির্দেশে। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে দেশবাসীকে বারবার বলেন, কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। উর্দুবাসী বা পাকিস্তানি লোকের ওপর নির্যাতন-অত্যাচার করা যাবে না। তা সত্ত্বেও কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শুভক্ষণ। দুটো ভাষণকে রাজনীতির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা হয়। একটি হলো শেখ মুজিবের ওই ভাষণ, অন্যটি প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস। আমার কাছে ভাষণের দুটো কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এক. 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি যার যা আছে তা নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।' আর দুই. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অর্থাৎ তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে জোর দিলেন বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলে তবেই অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন সম্ভব। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অপারেশন সার্চলাইট নাম দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে। তখনো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। সময়ক্ষেপণ হয়েছে। পাকিস্তানিরা এ দেশে সৈন্য আনার সময় পেয়েছে, সৈন্য নিয়ে এসেছে। অনেকেই দোষারোপ করছেন। এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, তখন বঙ্গবন্ধু তার দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা কৌশল নির্ধারণ করছিলেন। সব ব্যাপারে যে প্রস্তুতি ছিল তা নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই এই প্রস্তুতি ছিল যে, যদি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে, নেতৃবৃন্দ কে কোনদিকে কোথায় যাবেন, কীভাবে দিল্লির সরকারের এবং অন্যান্য মিত্র দেশের সাহায্য নেওয়া হবে সেসব বিষয় ঠিক করা ছিল। সে জন্য বড় নেতা কাউকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাড়িতে পায়নি।

২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন এবং ফোন করেছেন এরকম দাবিদারের সংখ্যা শখানেক। তবে সর্বশেষ তাজউদ্দীনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে আলাপ হয় বলেই মনে হয়।

শেখ মুজিব কেন বাড়ি থেকে সরে গেলেন না? এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি পালিয়ে যাওয়ার লোক নন। তিনি কোনো অন্যায় করেননি। তিনি তখনো পর্যন্ত স্বাধীনতার কথাটা পরিষ্কারভাবে বলেননি। ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন বটে আবার তা বলেননিও যে, আজ থেকে আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধু অবশ্যই ন্যায়ের পথে ছিলেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা পালিয়ে যাবেন? পালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ নাকি ভারতীয়রা দেন, মার্কিনিরাও দিয়েছিলেন। তৃতীয় একটা ব্যাখ্যা অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক দিয়ে থাকেন। সেটা হলো, তাকে খোঁজার নাম করে অপারেশন সার্চলাইট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করত, অনেক বেশি প্রাণহানি হতো।

অন্য একটি বিষয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও দুঃখজনক। বলা হয়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, পুলিশে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত বিপুল সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তারা কর্নেল এমএজি ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিল চট্টগ্রাম বন্দর, ঢাকা বিমানবন্দর এবং একটা নদীবন্দর বন্ধ করে দিলে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যেতে পারত না। তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হতো। সংসদ বসার সুযোগ না দিয়েই যেন সশস্ত্র সংগ্রাম করা হয়। ওই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু একদম রাজি হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটা সুযোগ দিতে হবে। দেশের ৫৬ ভাগ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কেন দেশ ভাঙার দুর্নাম নেবেন। তখন বায়াফ্রা যুদ্ধ হচ্ছিল নাইজেরিয়াতে। তিনি জানতেন, বিশ্বের কোনো শক্তি একজন দেশের বিচ্ছিন্নতাকারীকে সমর্থন করে না। কাজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে চাননি। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির কী মহিমা আজ পর্যন্ত কেউ বলেননি, শেখ মুজিব একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী, তিনি পাকিস্তানকে ভেঙেছেন। সবাই বলেছে, পাকিস্তানি শাসকদের গোঁয়ার্তুমি, সংসদ না ডাকার কারণেই এটা হয়েছে। আমার মনে হয়, শেখ মুজিবের এসব নীতি সারা বিশ্বে অনুকরণীয়।

নয় মাসের যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন। এ শহীদানদের মধ্যে অনেক নারীও ছিলেন। যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আপামর জনসাধারণÑ ছাত্র, শিক্ষক, জনতা, রাজনৈতিককর্মী, কৃষাণ-কৃষাণী, শ্রমজীবী, নারী, পুরুষ। এক কোটি মানুষ ভারতে দেশান্তর হলেন। বাকি যে সাড়ে ছয় কোটি লোক দেশে রয়ে গেলেন তারা প্রায় সবাই মুক্তিবাহিনীকে মনে-প্রাণে সাহায্য করলেন। অনেকে প্রকাশ্যে, কেউ কেউ গোপনে। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধটা শুধু যে দুই সেনাবাহিনীর লড়াই, সীমান্তে লড়াই তা কিন্তু নয়। দেশের ভেতরে গেরিলা বাহিনীও যুদ্ধ করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনী খুব প্রশিক্ষিত এবং আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্মুখে যেমন ছিল যৌথ বাহিনী : মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেমেয়েরা সম্মুখে আর পাশাপাশি বা পেছনে ছিল ভারতের সেনাবাহিনী। হ্যাঁ, তারা না থাকলে স্বাধীন হতো না। তারা সংখ্যায় বেশি ছিলেন, সুপ্রশিক্ষিত ছিলেন। তাদের জোর অনেক বেশি ছিল। সে কারণে পাকিস্তানিরা ভড়কে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি ছেলেমেয়েরা, শিল্পীরা, শিল্পপতিরা, খেলোয়াড়রা, সাহিত্যিকরা, লেখকরা, সাংবাদিকরা, সংস্কৃতিকর্মীরা যেভাবে প্রত্যেকটা ফ্রন্টে, প্রত্যেকটা ফর্মে যুদ্ধ করেছেন সেটা অসাধারণ। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটা আদর্শভিত্তিক যুদ্ধ। ‘বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়ার’ স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধ করেছে সবাই। সর্বোপরি এটা ছিল সত্যিকারের জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধ সম্মুখে হয়েছে, সীমান্তে হয়েছে, আবার গুপ্তভাবেও হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধ। সুতরাং সত্যিকারভাবেই এটা একটা জনযুদ্ধ হয়েছে। কেউ যদি বলেন, এ যুদ্ধ সশস্ত্রবাহিনী করেছেন ঠিক হবে না। আবার কেউ যদি বলেন, ভারতীয়রা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন এটাও ঠিক হবে না। একটা জনযুদ্ধ, বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মিত্রবাহিনীর সহৃদয় সহায়তায় এতে অংশগ্রহণ করেছেন। শেখ মুজিবের কৃতিত্ব এখানেই; সে জন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু। (চলবে)

লেখক : বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর